কবিতা বিকেল

উৎসব সংখ্যা ২০১০

উৎসব সংখ্যা - কবিতা বিকেল

উৎসব সংখ্যা- কবিতা বিকেল পরিবারের সংকলন প্রকাশের প্রথম প্রয়াস । কবিতাপ্রেমী আমাদের যাত্রা শুরু হয়েছিল ২০০৭ এর ২৬ জুন । জন্মলগ্ন থেকেই অতি সন্তর্পনে সময়ের পথ কেটেছি গৃহ থেকে গৃহান্তরে সাহিত্যের প্রবাহে । আমরা ১২টি ঘরোয়া সাহিত্য আসর করেছি, আরো করেছি দুটো জন্মদিন বাহির অঙ্গনে । কবিতা বিকেল আমাদের আড্ডাঘর, বড় বেশী আপন, কাছের ।

''কবিতা গল্প কাহিনী গদ্য রম্য ও রুপকথা
কবিতা বিকেল ভালবাসে সবই, বাঙ্গালীর ইতিকথা ।
ইচ্ছের পায়রা উড়তে চায় সুদুর দিগন্তে,
সাধ-সাধ্যের মধ্য সীমানা থাকে সদাই অনন্তে ।
বারো মাসের তেরো পাবন অসীম কাহন
কাব্য গাথা নৃত্য-গীতের নেইকো বাধন ।
ছকে বাধা দ্রুতগামী ব্যস্ত জীবন এই ভুবনে
সাহিত্যের প্রেম যে মোদের নেই গোপনে ।
উৎসবকে উৎস করে এটাই মোদের প্রথম প্রয়াস
বন্ধু সবাই সাথে থেকো আছে যাদের বঙ্গ-পিয়াস ।''

অজস্র শুভেচ্ছায় -
কবিতা বিকেল পরিবারের পক্ষে
মাহমুদা রুনু

এ সংখ্যায় যারা লিখেছেনঃ

মোহাম্মদ আবদুর রাযযাক
সিরাজুস সালেকিন
মমতা চৌধুরী
মাহমুদা রুনু
আশীষ বাবলু
রাজন নন্দী
আফরিদা মামুন প্রিয়েতা

প্রচ্ছদ করেছেনঃ আশীষ বাবলু

বাঙালির উৎসব

সিরাজুস সালেকিন

কথায় বলে বাঙালির বারো মাসে তের পার্বণ। ‘স্বপ্ন দিয়ে তৈরী সে যে স্মৃতি দিয়ে ঘেরা‘ - ডি এল রায়ের কথাটা আসলেই কত সত্যি - কত স্মৃতি দিয়ে যে ঘেরা আমাদের দিনগুলি। নানা রকমের সব আনন্দ-উৎসব লেগেই ছিল আমাদের ছেলেবেলায়।

বাঙালির সব উৎসবের সাথে জড়িয়ে আছে বাঙালির ভাষা, সংস্কৃতি, আচার আর অর্থনীতি। যতই দিন যাচ্ছে, বাঙালি যতই শিক্ষিত হচ্ছে এবং ঝুকে পড়ছে এর সংস্কৃতির দিকে - বাঙালির উৎসবের আয়োজন ততবেশী বর্ণ্যাঢ্য ও ব্যাপক হচ্ছে। এসব উৎসব পালনের আনন্দ ছড়িয়ে পড়ছে গ্রামে, শহরে আর সেই সাথে প্রবাসেও। পৃথিবীর যেখানেই বাঙালি - সেখানেই পালিত হচ্ছে বাঙালির সমস্ত প্রাণের উৎসব।

বাংলা নববর্ষ বাঙালির তেমনই একটি প্রধান উৎসব। অনেক অনেক আগে গ্রাম বাংলায় শুরু হওয়া নববর্ষের ক্ষুদ্র ও বিছিন্ন অনুষ্ঠানের নাগরিক উত্থান ঘটে তা এখন বিশাল সর্বমানবিক উৎসবে রুপান্তরিত হয়েছে। নববর্ষ উৎসব এখন সব বাঙালির - তা সে যেখানেই থাকুক না কেন। সব বাঙালির সখ্যের নিরন্তর বন্ধন এই বাংলা নববর্ষ। ছোট বেলায় নববর্ষে বাবা-মার সাথে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে যেতাম। মা সেদিন পোলাও-কোর্মা অথবা ইলিশ-পোলাও রান্না করতেন। শুধু আমাদের বাসায়ই না - পাড়ার সব বাসায় বিশাল খাওয়া-দাওয়ার হুল্লোর পড়ে যেত। সবাই একে অপরকে নিমন্ত্রণ করতো। মাঝে মাঝে পাড়ায় পাড়ায় ছোটখাটো বিচিত্রানুষ্ঠানও হোতো।

ছায়ানটের সাথে যুক্ত থাকার ফলে নববর্ষটা বেশ ভালোকরেই উপভোগ করতে পারতাম। আমরা ক‘বন্ধু মিলে সারারাত জেগে থেকে কল-রেডী মাইক এর লোকদের সাথে স্টেজ বানাতাম, মাইক লাগানোর কাজে সাহায্য করতাম। খুব ভোরে রমনা রেষ্টুরেন্টে মুখ-হাত ধুয়ে, চা-টা খেয়ে, পাজামা-পান্জাবী পড়ে স্টেজে বসে যেতাম গান করতে - উড়িয়ে ধ্বজা অভ্রভেদী রথে, ঐ যে তিনি ঐ যে বাহির পথে, আলোকের এই ঝর্ণাধারায় ধুইয়ে দাও, তুমি নির্মল কর, মঙ্গল কর, মলিন মর্ম মুছায়ে। কি যে ভালো লাগতো সাত সকালে রমনার বটগাছের নীচে বসে গান করতে। মনে হোতো যেন - স্বর্গ নামিয়া আসিল মর্তে - স্বর্গে উঠিল ধরণী। এক রকমের আবেশে ঘিরে থাকতো মনটা। সবার মনটা আসলেই নির্মল হয়ে উঠতো। এখন তো বাংলাদেশের বাঙালির সবচেয়ে বড় উৎসব বর্ষবরণ, লাখো বাঙালির সমাবেশ হয় এ উৎসবে।

বাঙালি মুসালমানদের সবচেয়ে বড় উৎসব ঈদ। ঈদ মানেই এক বিশাল আনন্দ। নতুন জামা কাপড়ের আশায় দিন গুনতাম। সেই সাথে বড়দের সালাম করলে পেতাম সালামি। বেশীরভাগই পেতাম এক টাকাট নোট। ঈদের সালামির বেশীরভাগ টাকাই চলে যেত আইসক্রীম বিক্রেতার পকেটে। সব বাসায় পোলাও-কোর্মা, গরুর গোস্তের কালিয়া, আস্ত মুরগীর মুসাল্লাম, খাসীর কলিজা আর পরোটা দিয়ে সকালের নাস্তা - এ গুলো যেন ছিল বাধাধরা। সেই সাথে নানারকম মিষ্টি। ঈদের আগের রাতে (চান্দরাতে) আম্মা নানারকম মিষ্টি বানাতেন। আমরা বন্ধুরা চাঁদা তুলে আতসবাজি কিনতাম আব্বার অগোচরে। চান্দরাতে সেই পটকা ফুটাতাম - কি যে আনন্দ - পটকার যত বেশী শব্দ, তত বেশী আনন্দ। সকালে গোসল সেরে আব্বার সাথে নামাজে যেতাম। নামাজ পরেই সবার সাথে কোলাকুলি। তারপর পাড়ার বন্ধুদের বাড়িতে গিয়ে বড়দের সালাম করার পালা - তবে এর মূল উদ্দেশ্য ছিল সালামি আদায় করা। কেউ সালামি দিতে ভুলে গেলে তাকে ছলে-বলে মনে করিয়ে দিতাম যে উনি সালামিটা এখনো দেন নি। এসব কথা ভাবলে এখন খুব আনন্দ পাই। ছেলেমেয়েদেরকে এসব গল্প বলি আর ওরা হেসে লুটিয়ে পরে। আব্বা আবার ঈদের সময় আমাদের পাশাপাশি গরীব মানুষদেরও নতূন কাপড় দিতেন।

আর কোরবানী ঈদের সময় দলবেধে গরুর হাটে যাওয়া আর গরুর দড়ি ধরে কয়েক মাইল হেটে বাসায় ফিরতাম। পথে দেখা হওয়া প্রায় সব ক্রেতাকেই তাদের গরুর দামটা জিজ্ঞেস করতাম আর সাথে সাথেই আমাদের গরুর দামটাও বলে দিতাম। এটা অবশ্য বড়দের দেখেই শিখেছিলাম। এক রসিক ত্রেতা আর একজনকে গরুর দাম জিজ্ঞেস করলেন, ভদ্রলোক সরল মনে দাম বললেন। দাম শুনে সেই ক্রেতা জিজ্ঞেস করলেন, ‘ভাই এটা কি শুধু গরুর দাম, নাকি তেতুলসহ দাম বললেন? আপনার গরুটা তো একদম বুড়া, এর মাংস রান্না করতে কয়েকমন তেতুল লাগবো।‘ যাইহোক, বাসায় ফিরে ঘাস-পাতা সংগ্রহের কাজে নেতে পড়তাম।

কোরবানীর দিনে সেই গরুকে যখন কোরবানী করা হোতো, তখন খুব কষ্ট পেতাম। কোরবানীর পর তিন-ভাগের একভাগ গরীব মানুষদের বিলিয়ে দিতাম, একভাগ আত্মীয়-স্বজন আর পাড়া-পরশীদের জন্য আর একভাগ নিজেদের জন্য। দুপুরের পর বের হোতাম গোস্ত বিতরণে। এর আর একটা কারণ ছিল - গোস্ত বিতরণ করতে গিয়ে সালামী আদায়টাও করা হয়ে যেত।

ঈদের পরই আসে দূর্গা পুজো। শরতের সাথে পুজোর যেন এক নিবিড় সখ্যতা। নদীর ধারে জলভেজা কেতকীর সুবাস, টগর আর মালতি ফোটার কাল এই শরত। নদীর ধারে কাশের গুচ্ছ যখন বাতাসে আন্দোলিত হয়, আকাশে যখন সাদা মেঘের ভেলা আর শিউলি ফুলের হাসি - এ সবই আমাদের মনে করিয়ে দিত - পুজোর মাস এলো বলে। মনে পড়ে ছোট বেলায় বাবার হাত ধরে কত না মন্ডপে ঘুরে বেড়িয়েছি। প্রসাদ খাবার জন্য উন্মুখ হয়ে থাকতাম। মনে আছে একবার আরতি নৃত্য প্রতিযোগীতায় পুরস্কারও পেয়েছিলাম - একটা সাদা তোয়ালে। পাড়ার সব ছেলে-মেয়ে মিলে মন্ডপে মন্ডপে ঘুরে বেড়াতাম। পুজোর সব ক'দিনই যাওয়া চাই - ঢাকের শব্দ আমাদের টেনে নিয়ে যেত মন্ডপে।

বাঙালির এরকম আরো অনেক উৎসব পালন করে আসছে। যেমন বৌদ্ধ-পূর্ণিমা বৌদ্ধ ধর্মালম্বীদের আর একটি উৎসব। আজকাল দেশের বিভিন্ন শহরে বর্ষামঙ্গল, শারদোৎসব, পৌষ মেলা, চৈত্র সংক্রান্তি এসবও পালিত হচ্ছে সাড়ম্বরে। খ্রীষ্ট ধর্মালম্বীদের বড় দিন ও পালিত হচ্ছে সমস্ত দেশজুড়ে। বড় দিনে আব্বার বন্ধু সিসিল বাবু, আমার বন্ধু নিবলেটদের বাসার নিমন্ত্রণ থাকতো প্রতিবছর। সান্টাকে দেখাও ছিল একটা বড় আকর্ষণ।

ছোটবেলায় আম্মার হাত ধরে আমরা দু'ভাইবোন মোহররমের মেলায়ও যেতাম। তখন ঢাকার আজিমপুর এলাকার বসতো বিশাল মহররমের মেলা। প্রধান আকর্ষণ ছিল মাটির তৈরী খেলনা, ডুগডুগি। এছাড়া আমাদের গ্রামে নবান্নর সময় বাউলদের মেলা বসতো। এসময় পালা গান, কবি গান, রামমঙ্গল আর যাত্রার আসর বসতো গ্রামে গ্রামে। সারাদিন কাজের শেষে মানুষ ছুটতো এ সব আসরে। আব্বার কাছে গল্প শুনেছি উনি নিজে রামমঙ্গল, পালা গান আর যাত্রাপালায় অংশগ্রহন করতেন। ওখানেই ওনার সঙ্গীতে হাতেখড়ি।

আমরা যারা তৃতীয় ভূবনের বাসিন্দা - এই সমস্ত উৎসব আর পার্বণ আমাদের কাছে এক নতুন অভিব্যাক্তি নিয়ে হাজির হয়। মন-প্রাণ আপনা-আপনিই নেচে ওঠে। কি জানি কেন এক ধরনের সুখানুভূতিতে ভরে উঠি, বার বার দেশের কথা মনে হয়, মা-র কথা মনে পড়ে, বোনের হাতের চুড়ির রিনিঝিনি যেন কানে বাজতে থাকে, এখনো সেই নতুন কাপড় এর গন্ধ এখনো নাকে লেগে আছে - এ এক অপ্রতিরোধ্য অনুভূতি।

আসুন আমরা আমাদের এই প্রবাস জীবনে নতুন করে জীবন নির্মানের সংকল্পে বুক বাঁধি, আমাদের ছেলেমেয়েদেরা এই প্রবাসেও বাঙালি মুল্যবোধ নিয়ে বড় হোক, সব উৎসব-পার্বনে ওরাও অংশগ্রহন করুক, বাঙালির শক্তিময়তা নিয়ে তারা গর্ব করার সুযোগ পাক - সব রকম হীনমন্যতা দূর করে আদর্শ মানুষ হয়ে গড়ে উঠুক। জীর্ণ-পুরাতন ক্ষুদ্রতা যাক ভেসে যাক - এই প্রত্যাশায় - আপনাদেরকে ঈদের উষ্ম অভিনন্দন জানাই।

পদ্য লেখার পদ্য

মোহাম্মদ আবদুর রাযযাক

মুঠোফোনে বললেন এডিটর ‘ ভাই
উৎসব সংখ্যায় লেখা যেন পাই।’

সখের পদ্য লিখে এ হয়েছে জ্বালা,
আমি যে ‘কষ্ট-কবি’ বোঝানো ঝামেলা।
(অবশ্য কতিপয় আঁতেল সুজন -
আমার ‘প্রতিভা’ নিয়ে করেন কুজন।)

অনুরোধে লোকে নাকি ঢেঁকি গিলে বসে;
আমি বসি লিখিবারে উৎসব রসে।

উৎসব কাকে বলে ? সে কত প্রকার?
প্রবাসে বাংগালী জানে জবাব তাহার।
ধর্মীয়, রাষ্ট্রীয়, কিবা সামাজিক
আমাদের সাথী হয়ে আছে তারা ঠিক।

চাঁদ-রাত, ঈদ, পূজো আর কৃসমাস,
একুশে ফেব্রুয়ারী, বিজয়ের মাস।
পৌষ মেলা আছে, আছে পিঠা উৎসব;
স্বাধীনতা দিবসের আছে মচ্ছব
পহেলা বোশেখ ভোরে প্রতীতির গান
ভরে তোলে প্রবাসীর তৃষিত পরাণ।
টেম্পি ও হোমবুসে বৈশাখী মেলা
(গাড়ী পার্ক করা নিয়ে সেথায় ঝামেলা।)
নেতার জন্মদিনে চামচার ভোজ;
ছোট বড় উৎসব লেগে আছে রোজ।
বিয়ে, এনিভার্সারী, বাচ্চার সাধ -
কোন টাকে নিয়ে লিখি? কাকে দিয়ে বাদ?

কোন উৎসব নিয়ে লিখি ভাবি তাই;
Focus না জেনে লেখা কঠিন বালাই।
এই সব ভেবে আর হলোনা তো লেখা;
এডিটর রাগবেন? পরে যাবে দেখা॥

সিডনী
১৫ নভেম্বর

ঈদের ব্যথা

মমতা চৌধুরী

টুপুর টাপুর নয়ন ঝড়ে
ঈদ আসেনা আর পরাণ জুড়ে,
ছোট্ট বেলার ঈদের স্মৃতি
হৃদয় জুড়ে হাতড়ে খুঁজি॥

নূতন জামা, নূতন জুতো
মিঠুর মাথায় আমার ফিতে,
কপট শাসন মায়ের মুখে,
মিঠুরে তুই আয়না ফিরে॥

আয় না, মোরা যাব আয়,
ফুল তুলতে শিউলি তলায়,
গাঁথবো মালা দীঘল করে,
খোপায় মা জড়ারে বলে॥

মায়ের নুতন শাড়ীর ভাজে,
তোর তরে 'ঈদি' লুকিয়ে আছে,
দু'জনে লুকিয়ে তক্তি খাব,
বাবা মা দুপুরে ঘুমাবে যবে॥

কত যে ঈদ গেছে চলে,
জীবন থেকে 'ছুটি' হয়নি বলে,
এলেম যখন তোদের তরে
গেলি কি চলে অভিমান ভরে!

ছোট্ট বেলার মত আবার
মার্বেল আর লুডু খেলায়, নয়ত
'আয়রে গোলাপ , আয়রে টগর' ,
ভরবে মোদের আঙ্গিনা সরব॥

শিশু বেলার যেমনি করে
পুতুল, বই নিতে কেড়ে,
দস্যিপনায় তেমনি মেতে
আয় নারে, ভাই, আয় না ফিরে॥

করবো না নালিশ বাবার কাছে,
সোনার কড়ি আমার আছে,
দেবো তোকে সবগুলো তার,
আয় রে মিঠু, ঘরে ফিরে আয়॥

হলুদ সার্ট মা রেখেছে তুলে,
গেছিস ফেলে যা মনের ভুলে,
আমিও এনেছি 'সুরভি' ভরে,
ঈদের পশরা তোর ও তরে॥

এত কি অভিমান বলত মোরে?
স্কুলে যেতি আমার হাতটি ধরে,
পায়ে পায়ে কত পথ আজ পেরিয়ে,
হারিয়ে গেলি কোন সুদূর দুরে॥

ঈদ আসে এই প্রশান্ত পাড়ে
মেয়ে সাজে মোর ঈদের সাজে,
জানিনা সে বুঝে কি না বুঝে
ঈদ কেন মোর অশ্রু নীরে ভাসে!

জানি তুই আসবি ফিরে
নিতে আমায় খেয়ার পাড়ে,
সন্ধ্যা তারা উঠবে জ্বলে,
যাবো মোরা অচিন পূরে॥

১০ই নভেম্বর, ২০১০
রাত ৩: ১০

খুকু

আশীষ বাবলু

(অন্নদাশঙ্কর রায়ের কাছে ক্ষ্মা চেয়ে)

তেলের বাটি ছার
খুকুর প'রে রাগ করার
সাধ্যি এখন কার ?
কোনটা পাবে দাদু-দিদা
মা-বাবা চাকরে
খুকুই এখন ভাগ করে ।
মেয়েবেলা !

সার্বজনীন উৎসব

রাজন নন্দী

তখনও আমাদের যৌথ পরিবার, ভোর রাতে সেজো জ্যাঠার ঘরের বারান্দায় দাদুর আমলের তিন ব্যাটারীর রেডিওটা ঘিরে জমে উঠত একটা শব্দহীন ভিড়, এখনও চোখ বুজলে, সেই ভীড়ের ভেতর ২৫ বছর আগের আমিকে দেখতে পাই, দেখতে পাই রেডিওর পাশে চেয়ার পেতে বসা সেজো জ্যাঠাকে - পান চিবুতে চিবুতে অভ্যস্থ হাতে রেডিওর নব ঘুরাচ্ছেন, কাটা এঘর ওঘর করার সময় অদ্ভূত একটা গড়র . . গর আওয়াজ করত, এক সময় তা ছাঁপিয়ে শোনা যেত আকাশবাণী থেকে প্রচারিত বীরেন্দ্র ভদ্রের কণ্ঠে পঠিত 'মহালয়া', এর ক' বছরের মধ্যেই আমার কৌতুহল মেটাতে গিয়ে প্রান দিয়েছিল রেডিওটা, সেজো জ্যাঠাও স্বর্গবাসী হয়েছেন অনেক বছর হল, অথচ মনে হয় এইতো সেদিন! স্মৃতিচারণ মানেই তো ফিরে দেখা, ফিরে ফিরে দেখা যাপিত জীবন, আমরা প্রতিনিয়ত ফিরে যাই, কখনও কখনও ফিরেও পেতে চাই ফেলে আসা সেই জীবন, নিশিতে পাওয়া মানুষের মত ঘুরে বেড়াই স্মৃতির বিস্তৃত উঠানে,

'অক্ষয়া ত্রিরাত্রি' থেকে প্রতিমা তৈরীর কাজ শুরু হত, প্রতিমা তৈরীর নানা পর্যায় আছে, আছে নানা সংস্কার, পৌরাণিক মিথ, সময় করে আর একদিন সেই গল্প করা যাবে, আজকে বরং উৎসবের সলুক সন্ধানে হানা দেয়া যাক আমার কৈশরের অভিজ্ঞতার ভাঁড়ারে, আমাদের পাড়ার পূজা হত বসাক বাড়ীর উঠানে, প্রতিমাও তৈরী হত তাদেরই এক চাতালে, পূজার আগের কয়েক মাস নিয়ম করে সকাল-বিকাল হাজিরা দিতাম সেখানে, স্কুল থেকে ফিরেই ভোঁ দৌড়, নাওয়া, খাওয়া ভুলে পড়ে থাকতাম, আসত পাড়ার নানা বয়সের ছেলে বুড়োরাও, আড্ডা দেওয়ার হাতে খড়ি আমার এভাবেই হয়েছিল, যাহোক, চোখের সামনে ধীরে ধীরে কাঠামো দাঁড়িয়ে যেত, এরপরে আমাদের ধৈর্য্যের পরীক্ষা নিতেই কিনা, প্রতিমা শিল্পী (পাল) চলে যেতেন অন্য কোথাও কাঠামো গড়তে, কিন্তু আমাদের আসা যাওয়ায় তাতে ছেদ পড়তনা, তিনিই বরং একসময় ফিরে এসে কাঠামোতে মাটি বসানো শুরু করলে, উৎসাহ যেন আরও চাগিয়ে উঠত, ক্রমে তৈরী হয়ে যেত প্রতিমা, মহালয়াতে চক্ষুদান হয়ে গেলে, সারা পড়ে যেত - পূজার যে আর বাকী মাত্র ছয় দিন,

পূজার ৫ দিনের জন্য ৫ খানা নতুন কাপড় মেলানোর উত্তেজনা কি করে ভুলি? আল - রেডিয়েন্টের জামা, প্যান্ট, বাটা বা হাবিব সুজ এর জুতা পড়ে সকাল সকাল গিয়ে দাঁড়াতাম মন্ডপের সামনে, মঞ্চে দশভূঁজাও তখন সুসজ্জিত, সে এক বয়েস ছিল মুগ্ধ হবার, বড় হতে হতে পাল্লা দিয়ে কমতে থাকে আমদের মুগ্ধ হবার ক্ষমতা,

পাড়ার বারোয়ারী পূজা, ছোটবেলা থেকে দেখেছি শুভোদ দা, মঙ্গল দা, রাধাবল্লভ দা'দের পূজার যাবতীয় আয়োজন করতে, আমরা কেবল উৎসবের আনন্দটাই উপভোগ করতাম, আমি যখন ক্লাস এইটের ছাত্র, কাকতালীয় ভাবে দ্বায়িত্ব এসে পড়ল আমাদের উপর, নয়ত পূজাই হয় না, ৯০ - ৯১'র সেই অস্থির সময়, আমাদের মধ্যে সবচেয়ে উদ্যোগী-সাহসী-বেয়াড়া ছিল বুড়া (রনজিৎ), ছিল মহল্লার সবচেয়ে সুদর্শন উত্তম, গোয়ার গোবিন্দ হারান, বিষ্ণু আর আমার ছোটবেলার সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ বন্ধু রুমন, সেই বার আমরাই সিংহ (দূর্গার বাহন) হলাম!

পূজার আয়োজন এক মস্ত কর্মযজ্ঞ, যেন তেন করে করলে পাড়ার মান থাকে না, আবার আড়ম্বড়ের জন্য দরকার বিস্তর অর্থের, সাম্প্রদায়িক অস্থিরতার সেই সময়ে অত টাকা যোগাড় করাটা মোটেও সহজ ছিলনা ছয়-সাতজন কিশোরের জন্য, তবুও আমরা গোঁ ধরলাম, পাড়ার মান রাখতেই হবে, কাজ শুরু করেছিলাম ছয়জনে, দ্রুত সেটাকে সমবয়সীদের মধ্যে সার্বজনীন করাতে সক্ষম হলাম আমরা, অচিরেই দেখা গেল অর্ধশতাধিক কিশোর নানা দলে ভাগ হয়ে কাজ করছে, আর সেই বড় দলে, হাতে গোনা কয়েকজন ছাড়া কেও হিন্দু ধর্মাবলম্বী ছিলনা, সংগঠনের ধারনা, অসাম্প্রদায়িক ঐক্যের ভাবনা তখন থেকেই শিখেছি,

ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে শহর চষে বেড়িয়েছি চাঁদার রশিদ হাতে, সেই আমার সত্যিকারের শহর চেনা, টাকার আরও একটি বড় উৎস ছিল বাঁশ বিক্রির টাকা, ট্রাকে চড়ে পৌঁছে যেতাম আশেপাশের বাঁশবহুল গ্রাম গুলোতে, বাড়ি প্রতি দুই-তিনটি করে কাটা যেত, দিনশেষে ট্রাক ভরে মহল্লায় ফিরতাম, এই কাজটি খুব সহজ ছিল না,

কখনও কখনও ঝামেলা হত গ্রামের লোকদের সঙ্গে, দৌড়ে পালিয়ে জীবন বাঁচাতে হয়েছে কয়েকবার, কেউ কেউ হামলায় আহতও হত, পাল্টা হামলার ব্যাপারও ছিল, আবার বেশী দেরী করে বাড়ি ফিরলে বাবার হাতেও নিস্তার ছিলনা, এইভাবে নানা উত্তেজনায় প্রস্তুতি চলতে থাকে,

আমাদের ততদিনে কোনও ধারনাই ছিলনা যে, কত হাজার রকম উপকরণ লাগে প্রতিমা তৈরীতে - পূজায়, যার কিছু কিছু কিনতে পাওয়া যায় না, যোগাড় করতে হয়, এমনি এক আবশ্যকীয় উপকরণ 'গণিকালয়ের মাটি' বা 'পূণ্য মাটি', ভদ্রজনেরা যাকে বলেন 'খারাপ পাড়া' এবং সঙ্গত কারনেই প্রকাশ্যে কেও সেখানে যেতেন না, আমরা তখনও 'ভদ্রলোক' হয়ে উঠিনি আর সেই বিশেষ মাটি না হলেও যেহেতু চলবে না; আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম যাবার,

কয়েকটি রিকশায় চেপে চলল আমাদের বড় দলটি, কেও দেখে ফেলবার ভয় আমাদের ছিলনা, তবুও একটা অস্বস্তি ছিল, আমাদের দলেরই ক'জন ইঁচড়ে পাকা নোংরা মন্তব্য করছিল, আমার ভাল লাগছিলনা, ততক্ষনে আমরা পৌঁছে গেছি, এবার মাটি নিতে হবে কোন একজন যৌনকর্মীর ঘরের সামনে থেকে, দিনের আলোয় দল বেঁধে এতগুলো কিশোরের আসাটা স্বাভাবিক ঘটনা ছিলনা, তবুও কেউ কেউ ডাকছিলেন সম্ভাব্য খদ্দের ভেবে, নোংরা পরিবেশ, খিস্তি- খেউড়ি, চৌঁয়াড়ে লোকজন সব ছাঁপিয়ে আমার চোখ টানলো নানা বয়সের শিশুগুলো - এই সমাজের পাপের অধ:েক্ষপ, ততক্ষনে একজন বৃদ্ধা'র ঘরের সামনে থেকে মাটি নেওয়া হয়েছে, আমরা ফেরার পথ ধরলাম, মনে অসংখ্য প্রশ্ন নিয়ে, আমার সেই বয়স অবধি মানবতার এমন চরম অমর্যাদা, জীবনের এহেন কদর্যতার কোন ধারনাই ছিলনা, সেই বৃদ্ধা তার নিরবতা দিয়ে যেন সরব করে দিয়েছিলেন আমার লেখনিকে -

"এক বৃদ্ধা বেশ্যার হয়ে বলি,

যৌবন তারও ছিল একদিন হয়েছিল যার বলী

সমাজের পাপকাষ্ঠে,

সে সমাজ, যে বেশ্যার সাথে জড়ানো আষ্ঠেপৃষ্ঠে. . ”- ঘটনাটা আমাকে এতটাই প্রভাবিত করেছিল।

আমরা আমাদের কথা রেখেছিলাম। সেবারের পূজায় জাঁক জমকের কমতি হয়নি। তবে রাত জেগে জেগে মন্দির পাহাড়া দিতে হত বলে ক্লান্ত ছিলাম সবাই। অষ্টমীর রাতের সেই দূর্দান্ত আরতির (ধুনচি নাচ) কথাও ভুলবনা। সব মিলিয়ে সেবারের পূজা ছিল পরিপূর্ণ উৎসব। আনন্দ, উত্তেজনা যেমন ছিল, তেমন ছিল দ্বায়িত্ব, উদ্বেগ আর চাপ। পরের বছর বাড়ি পাল্টে আমরা অন্য পাড়ায় চলে যাই, রুমনরাও কিছু আগে পরে। জীবন - বোধ পাল্টে যাচ্ছিল আরও দ্রুত। উৎসব ভাবনাও তখন আর কেবল পূজাতে সীমাবদ্ধ থাকেনি।

এরপর সময়ে বয়েস বেড়েছে শরীরের, বিশ্বাসের সহজ পথে সমর্পিত না হয়ে মন ক্রমশ হয়েছে যুক্তিবাদী। আর তাই খুব বিশ্বাস করি জাতীয়তা বিকাশে সার্বজনীন উৎসবের প্রয়োজনীয়তায়। যেমন পহেলা বৈশাখ, তেমনি ধর্মীয় গাম্ভীর্যকে সাথে নিয়েও দূর্গা পূজা বা ঈদকে ঘিরে সার্বজনীন উৎসব সম্ভব। যুক্তিভূক এই বিশ্বাসই কি স্বপ্ন! স্বপ্ন আমার সার্বজনীন উৎসবের।

উৎসব

মাহমুদা রুনু

কালের ধারা
তার নিজস্ব কারুকাজে
অতীতকে গাথে ইতিহাসে ।
এখন আর সময় নদীর স্রোতের
ধায় চলে না,
চলে সুপারসনিক গতিতে ভবিতব্যের আশে।
বেগবান বিজ্ঞানের জ্ঞানে
ইতিহাস ধায় আলোকবর্ষ দুরে অতীতে।
উৎসব আনন্দের স্বকিয়তা, মৌলিকতা
দ্রুত মিশে যাচ্ছে
উদযাপনের কৃত্রিম আনন্দ বৈভবের নীতিতে।
আদল অবয়বে ভিন্ন সাজে
আচার-তত্ব ভিন্ন ধারায় বিরাজে।

ছোট্ট শহরে ঈদ-পুজো উৎসবে
মোগলাই, লুচি-নাড়ু আর বাদ্য-বাজনায়
ছিলোনা বাহুল্যতার ঝকমারি ।
প্রবল আকর্ষন ঈদ-সংখা বিচিত্রা,
পুজো-সংখ্যা উলটোরথ,
মান্নাদে, চিন্ময়, আরো বহু
পুজো রেকর্ড রকমারি।
সার্বজনীন অবাধ আনন্দ-হুল্লোর,
বন্ধুর সাথে প্রতিযোগিতা
কবিতা, উপন্যাস পাঠের পাল্লা'র ।
কত বেশী বন্ধু-স্বজনের দেখা,
কত বেশী ফিরনি-পোলাও-নাড়ু-লুচি,
কতোটা অর্জন আনন্দ মল্লার ।

আজিকার উৎসবগুলো মাতায়
অর্থের অনর্থক বাহুল্যতায়,
ফ্যাশনের ফিউশন প্রতুলতায় ।
টিভি চ্যানেলে চলে সাতদিনের
বিনোদন রাতদিন।
ইলেট্রনিক বিনোদন
সময়ের সুস্পষ্টতায় সমীচিন ।

পাঠসাহিত্য চলে গ্যাছে
দর্শন সাহিত্যের করতলে;
ঈদ সংখ্যা বিচিত্রা, উলটোরথ
আছে কি এ ধরাতলে ?

উৎসবের ছুটিগুলো বিত্তশালীর
বিদেশ ভ্রমন ।
মধ্যবিত্তের কক্সবাজার ভ্রমন ।
নিম্নবিত্তের দায়পরা ঘরমুখী যাত্রা যেমন।
ঈদের আনন্দ রকমফের এইরকম ।

প্রবাসে ঈদ এলেই শুরু হোয়ে যায়
সেই বস্তাপচা লড়াই;
চাঁদের জন্মের-দর্শনের বিতর্কে
সুফিজনের আত্মম্ভরিতার
বিজয়ের বড়াই ।

আশার কথা - সে বিভেদ ক্রমশঃ
কমে আসছে, সাধারণের প্রবেশে
একদিনে একসাথে ঈদের উদযাপনে ।
জমে ওঠে তা সপ্তাহ শেষে
ধর্মীয়-সামাজিক-ভোজন আবেশে ।

উৎসবে সামিল সবে একসুরে একলয়ে
সার্বজনীন চেতনায় ।
সামাজিক বৈরিতার বিপরীতে
ঈদ-পুজো-কুরবানী
উদযাপনের উদ্দিপনায় ।
কার্পন্য নেই ক্রুটিহীন আয়োজনে
একাত্বতার প্রয়োজনে -
অঢেল সাধুবাদ সকল গুণীজনে
আয়োজনে প্রয়োজনে
যারা বাঁধে বুক একসনে ।

১০ নভেম্বর ২০১০

EID

Afrida Mamun

Eid,
It’s a day full of smiles
Excitement
Happiness
And colourful moments .

You wake up in the morning,
With an elated mood
Pondering at the astonishing moments
That this day shall bring

From eating and cherishing varieties of foods
Meeting and greeting with endless friends
And also dressing and transferring into a wardrobe of new clothing
And definitely having a passion to have everlasting fun

This miraculous day doesn’t come every now and then
It’s a twice a year enlightenment to our lives
These two days are memorable days every year
They’re different and excessively enjoyable

Decorate the house
Cook diverse and rich foods
Wear dazzling and eye-catching clothing
What is there not to have fun on eid?

This day is a day where everything’s ok
From spending ridiculous amounts of money
Just on celebrating this day
And just to do everything to have fun

The fact of just
Dressing up as glamorously as possible
And cooking and eating new and occasional foods
It’s a delightful excitement
Only because we don’t cherish these moments everyday

These types of days are one of a kind
A day to smile, to hang out
To eat, to enjoy, to absorb all the fun filled moments
And just smile …

Until the next eid to come.. And brighten our two days of the year again ..

ঈদ-পূজো স্মৃতি

মমতা চৌধুরী

ঈদঃ

ঈদ শব্দটার সাথে যে আনন্দ আর উত্তেজনা জড়িয়ে থাকতো বাল্য আর কৈশরে, আজ তা অনেক দূরে ফেলে এসেছি। তবুও ঈদ আসে তার নিজের কক্ষপথে, বছরে দু'বার, কখনো সরবে আবার কখনো বা নিরবে, কোন অভিমানী ঘর ত্যাগি পথিকের মত চলেও যায় আপনার পথে। ছোট্ট বেলার আনন্দঘন সুখময় স্মৃতিগুলোর রোমান্থনের মাঝেই ঈদ যেন হয়ে উঠে জীবন্ত -তার রূপ রস ঘ্রানে। রোজার ঈদ ছিল আমাদের শিশুবেলায় সবচেয়ে কাঙ্খিত একটা উৎসব। প্রায় দশমাসের ব্যবধানে একমাস রোজা রাখার পর এবং রোজার শেষ সপ্তাহে শবে কদরে সারা রাতভর নামাজ পড়াও ছিল উৎসবের অংশ। পরদিন সকালে কে কত রাকাত নামাজ পড়েছে ভাই বোনদের মাঝেও তার এক প্রতিযোগিতা চলত প্রতি বছর। আমার কিশোর ভাইয়েরা খালাতো চাচাতো ভাইদের সাথে সারা রাত এ মস্‌জিদ থেকে অন্য মস্‌জিদে যেত নামাজ পড়তে। ঐ একটা দিন আমার বাবা আমার ভাইয়েরা মাগরেবের আজানের আগে বাসায় না ফিরলে কিছুই তেমন বলতো না, তবে আমাদের বাসার দারওয়ান বা কেয়ারটেকারকে ওদের সাথে নিতে হত। রোজার ঈদেই সবার জন্য আসত নূতন জামা, নূতন জুতো এবং অন্য সব সাজ সজ্জা। যে বাসায় বেশি কন্যা সন্তান থাকত, তাদের সবার জন্য একই প্রিন্টের কাপড় দিয়ে বানানো হতো সালওয়ার কামিজ বা ফ্রক, যা আমাদের কন্যারা এযুগে বসে কল্পনাও করতে পারবে না। অনেক দিন পর্যন্ত বাবা মা একমাত্র কন্যা সন্তান হওয়ায় ভাগ্য বশত আমার কদর নিজের বাসায় এবং অনেক আত্মিয়স্বজনের কাছে ছিল অনেক বেশি, আর তাই আমার জন্য সব ঈদেই রেডিমেইড পোষাক কেনা হতো ময়মনসিংহের তখনকার অভিজাত বিপনি 'সাহা ট্রেডিং' থেকে। শহরে আমার বড় খালাম্মার বাসায় আমাদের যাওয়া আসা ছিল সব চেয়ে বেশি। তার উপর উনাদের সংসার ছিল ছয় ছেলের হৈচৈ'এ মুখর। ওদের মাঝে শান্ত স্বভাবের জন্য আমার আদরটা সংগত কারণেই একটু বেশি ছিল এবং তা নিয়ে সমবয়সি ভাইদের সাথে আমার যেমন ঘনিষ্ঠতা ছিল তেমনি তাদের রোষানলেও আমার দগ্ধহতে হত অহরহ। খালাম্মা খালু আমাকে ঈদে নানা উপহারে ভরে দিয়ে উনাদের কন্যার সাধ মেটাতেন। একবার ঈদে আমার জন্য খালাম্মা বানিয়ে দিলেন গোলডেন ব্রোকেডের ফ্রক, আর তা নিয়ে আমার ছোট খালাতো ভাই জিয়ার সে কি রোষ, ওর ও ওমনি একটা জামা চাই! যতই ওকে বুঝানো হয় যে ছেলেরা ওমনি কাপড়ের জামা পরেনা, ততই ওর জেদ বেড়েই যায় কেন সব সময় 'ওই পচা মেয়েটার জন্য সবচেয়ে সুন্দর জিনিষ আনা হয়?' চিৎকারে। সেই সুন্দর চেহেরার স্পর্টিভ জিয়া প্রায় তিন যুগ পরে এসে অনেক বদলে গেছে, আজও আমি দেখা হলে জিয়াকে তার 'সিবলিং রাইভেলরি'র কথা মনে করিয়ে দিয়ে মজা পাই। আজও আমার সাথে আমার খালাতো ভাই বোনদের খুবই সুন্দর সম্পর্ক।

আর এক ঈদের একটা স্মৃতি মনে করে এখন মনে হয় তিন চার দশক আগে বাংলাদেশের মানুষেরা কত সহজ সরল ছিল। আমি তখন ক্লাস এইটের ছাত্রী। বিচিত্রায় কোন এক বিদেশিনী মেয়ের 'ফ্রিল হাতা' জামার ফ্যাসন দেখে ভাল লাগলো। আমার ভাল লাগার কথা বলতেই আমার তরুনী মা আমার জন্য ইন্ডিয়ান ভয়েলের সাদা আর হলুদ রঙ্গের কম্বিনেশেনে দীপা টেইলরস্‌ থেকে জামা বানিয়ে আনলেন ঈদের আগের দিন। কিছুক্ষন পর বড় খালাম্মা এলেন বেড়াতে এবং আমার আম্মাকে বললেন 'ওর জামাটা টেইলর বানিয়েছে, ধুয়ে ফেল, বাইরের ধূলোবালি লেগেছে নিশ্চয়ই - -'। যেই বলা, সেই কাজ! তবে জামাটা পানিতে ডুবানোর সংগে সংগে বালতির পানি গাঢ় হলুদ রংগে রাঙ্গা হয়ে উঠল - আর তা দেখে আমার চোখের পানিও অপ্রতিরোদ্ধ হয়ে উঠল। খালাম্মা আমার জলভরা আঁখি দেখে বিব্রত বোধ করলেন আর তার সাথে যৌথ প্রযোজনায় অংশ নেওয়ার জন্য আমার আম্মাও অপ্রস্তুত হয়ে গেলেন। খালাম্মা নানা আদরের কথায় আমায় সান্ত্বনা দিতে চাইলেন - বললেন শুকালেই রং পাকা হবে এবং আরো উজ্জ্বল হয়ে ফিরে আসবে। খালাম্মা বিকেল পর্যন্ত রয়ে গেলেন। জামা শুকালো, ইস্ত্রি ও করা হল আনেক যত্নে, রং ত ফিরে এলোই না বরং না হলুদ না সাদার মাঝে একটা ফ্যাকাসে বিশ্রি রংগের আড়ালে হারিয়ে গেল আমার এত সাধের 'ফ্রিল ডিজাইনের জামা'। সন্ধ্যায় কন্যাঅন্তপ্রাণ আমার বাবা ঘরে ফিরে এসে আমার আঁখির বড় বড় ফোটার নিরব বর্ষন দেখে আবার বের হলেন। এবার 'আসাদ মার্কেট' থেকে এলো আমার জন্য আর এক সেট পোষাক ঈদের আগের রাতে যার মূল্য হয়ত তখনকার সময় একশত টাকার ও কম ছিল কিন্ত তা নিয়ে এলো আমার চোখে হাজার তারার আলো।

ঈদ আসলেই মনে পড়ে আব্বাকে আর দুষ্টু মিঠুকে ভীষন ভাবে। দু'জনেই আজ তারা তারার দেশে। প্রতি ঈদে আব্বা আমাদের তিনভাইবোনকে গরম জলে গোসল করিয়ে দিতেন - সেই চার দশক আগে ঈদ আসতো মাঘের শীতে। মিঠু আমার ক'বছরের ছোট হওয়ার কারণেই হয়তো আমার সব জিনিষের উপর ওর অপ্রতিরোধ্য দূর্বলতা ছিল। দু'ভাইয়ের মাঝে আমার জামা জুতো ফিতে চুড়ি একটু আলাদা হওয়ায় শিশুকাল থেকেই ওর অবরোধ্য আকর্ষণ ছিল আমার জিনিষে এবং প্রায়শই আমার আগে ঈদের দিন দেখা যেত আমার পোষাক পড়ে সে দিব্যে নির্বিকার ভাঙ্গিতে ঘুরে বেড়াচ্ছে আমার হতাশ জলভরা দৃষ্টির আঙ্গিনায়।

সব উৎসরের সাথে খাবারের আয়োজনটা একটা মূখ্য অংশ। আজো আমার স্মৃতিতে শৈশবের ঈদের রান্নার ঘ্রান ফিরে আসে। ঈদের ক'দিন আগে থেকেই শুরু হতো প্রস্তুতি। বাড়ীঘর পরিষ্কার, বিছানার চাদর , বালিশের কাভার বদলানো, জানালা দরজার পর্দা পালটানো হতো ঈদের দিন সকালে কিংবা আগের রাতে। কোরবানী ঈদের দু'তিন দিন আগে থেকেই বাসায় বাড়তে কাজের লোক আসতো - কাজের মানুষকের পাশে বসে পেয়াজ, রসুন, আলুর খোসা ছড়ানোর জন্য কত যে বায়না ধরেছি - আর কিছুক্ষ্ন পর চোখ আর নাকের জলের বন্যায় কোন অজুহাতে পালিয়ে যাওয়ার পন্থা বের করেছি তা ভেবে আজও হাসি পায়। কোরবানী ঈদে আব্বা আম্মাকে কোরবানী হওয়া পর্যন্ত রোজা থাকতে দেখতাম বলে মনে পড়ে। কোরবানী ঈদে আমার বাবা নামাজ থেকে এসে কোরবানী দিতেন আগে থেকে ঠিক করে রাখা কসাইদের সাহায্যে - আর সকাল থেকে আমি ঘর থেকে বের হতাম না কোরবানীর গরু বা খাসীর করুণ ডাক শুনতে হবে বলে, যাকে গত ক'দিন ধরে কাঠাল পাতা, ঘাস খাইয়েছে অনেক আদরে। সন্ধ্যার পর পরিবারের সবাই মিলে আমরা যেতাম খালাম্মার বাসায়। আমার মার কালিজিরা চালের সুগন্ধি পোলাও আর খালাম্মার রান্না মাংশ মননের কোঠা থেকে আজও সুরভি ছড়ায়। পৃথিবীর দেশে দেশে ঘুরে - হাজার রান্না খেয়েও ঐ রান্নার স্বাদ তেমনি অম্লান রয়ে গেছে।

আমার বান্ধবীরা ঈদে বেড়াতে আসতো সকালের দিকেই বেশি, কিন্তু দুপুরের খাবার পরিবারের সবার সাথে করার পর আমার অনুমতি মিলত কোথায় বেড়াতে যাওয়ার - তবে সাথে থাকত বড় ভাই, মিঠু কিংবা পরবর্তিতে ছোটবোন। একবার ঈদের আগের দিন আমার এক বান্ধবি এসে আমার মার কাছে আবদার করলো ঈদের দিন আমাকে ওদের সাথে খাওয়ার জন্য। ওদের বাসায় বেড়াতে যাওয়ার জন্য মা একরকম অনুমতি দিলেন। ঈদের দিন বিকেল হয়ে আসল আর তখন আমার বান্ধবি মলিন মুখে ওর ছোটবোনকে নিয়ে এলো এবং বলল 'আমি ত সারাদিন তুই আসবি বলে না খেয়ে বসে আছি - -'। আমি বেশ একটু অপরাধী বোধ করলাম এবং মার অনুমতি নিয়ে ওদের বাসায় গেলাম এবং জোর করে হলেও আবার ওদের সাথে খেলাম। ওর আম্মা রান্নার স্বাদ সত্যিই অপূর্ব। প্রায় তিরিশ বছর পর প্রতিবেশি দেশের মাটিতে ওর সাথে আবার দেখা, ওর মার মত ও পরম মমতায় নিজ হাতে রান্না করে নিজ হাতে পরিবেশন করে আমায় খাইয়েছে, যা হয়ত ওর মত অনেক নন্দিত বা নিন্দিত ব্যক্তিতের সাথে সামঞ্জস্য পূর্ণ না। বিশ্বজোড়া যে নামের সাথে যেমনি আছে অনেক বির্তক, নিন্দা, তেমনি আমি দেখেছি 'পূজা'র আসনে বসাতে ওর ব্যক্তিত্বকে। একই মানুষের ভেতর যে কত কঠিন আর কত কোমল মায়া লুকিয়ে থাকে বিধাতা ছাড়া আর কে তা জানে!

কোরবানী ঈদের বিকেল পড়ে আসার সাথে সাথে মন খারাপ হয়ে যেত। আবার রোজার ঈদের জন্য প্রায় দশমাস অপেক্ষা করতে হবে ভেবে - আর ঐ দশমাস যেন কাটতেই চাইত না। তবুও কেটে গেছে অনেক বছর, অনেক অনেক ঈদ! গত দশমাসও কেটে গেছে যেন চোখের পলকে যা বুঝতেই পারিনি। শুধু জানি কত কাজ জমে আছে স্তরে স্তরে শেষ হওয়ার অপেক্ষায় বছর শেষের আগে। আমার বাল্য কৈশরের দিনগুলো হাত ছানি দিয়ে ডাকে কাজের মাঝে মাঝে, ইচ্ছে হয় শিশুকালের মত নির্মল আনন্দে মেতে উঠতে ঈদ উৎসবে, যখন প্রতিক্ষা করতাম ঈদের পদধ্বনি শোনার জন্য, মামার কাছ থেকে চার আনা ঈদি পাওয়ার জন্য, নূতন জামা জুতোর ঘ্রানে ঈদের আগের রাতে রোমাঞ্চিত হতে, কোরবানী ঈদ থেকে রোজার ঈদ পর্যন্ত এক টাকা জমানোর অপার আনন্দে, এবং এত পয়সা দিয়ে কি করবো তা জল্পনা কল্পনায়। আমার ঈদের স্মৃতির সাথে জড়িয়ে রবে চিরদিন জড়িপাড় টাংগাইল শাড়িতে মায়ের লাবন্যময়ী মুখশ্রী, পিঠ ছাপানো সদ্যস্নান করা ভেজা চুল আর র'সিল্কের পাঞ্জাবিতে বাবার সুদর্শন দীঘল ছায়া। কত দূরে আজ বাবা মা ভাই বোনের ছায়ায় একই বৃন্তে একগুচ্ছ ফুল হয়ে আনন্দের সমিরনে দোলার দিনগুলো! তারপর পথে পথে দেশে দেশে ঈদ এনেছে অনেক সুখ দুঃখের স্মৃতি, আবার তা ম্লান হয়েও গেছে ছোটবেলার স্মৃতির কাছে। আজ মনে হয় পৃথিবীর সব কিছুর বিনিময়ে যদি ফিরে পেতাম সেই সব আনন্দময় উৎসবক্ষনের ক'টা মুহূর্ত!

আব্বা চলে গেলেন, কি ভেবে মিঠুও অবেলায় বাবাকেই খুজতে গেল বোধ হয়! দাদা ইংল্যান্ডে ছিল অনেক বছর, শ্রাবনী কেনেডায়, মা উত্তরায়। খালাত ভাই বোনদের অনেকেই পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে। মা বলে ‘সারা জীবন কোরবানী দিয়ে এসেছি - করতে ত হবেই, কাজের লোকজনেরা ‘আশা’ করে, যতদিন বেঁচে আছি করতেই ত হবে ওদের মুখের দিকে চেয়ে- -’। কিন্ত কে করবে? গরুর হাটে চড়া দামের সামনে নিজেই গরু বনে দিরে আসে মার প্রতিনিধিরা - মাকে বাজেট বাড়াতে হয় দফায় দফায়। ঈদ এলেই আমার বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয় মিঠু আর আব্বা ঈদের জামাতে গেছে - হয়ত স্নিগ্ধ শান্ত শুভ্র ঈদে ওরাও এই মলিন ধূলির ধরায় ফেলে যাওয়া প্রিয়জনদের কথা ভাবছে, স্মৃতিচারন করছে কোন এক ঈদ আনন্দের।

ঈদ আসে, ঈদ যায়, কত স্মৃতি ভিড় করে আসে। ঈদ এসেছে বরফে ঢাকা উইনিপ্যাগে, ঈদ আসে মাবোদের এই লাল মাটির দেশে প্রশান্ত পাড়ে - কখন প্রচন্ড গ্রীস্মে, কখন বা একটু শীতলতার পরশ নিয়ে। উইনিপ্যাগে প্রথম ঈদে যখন মেনিটোবা উনিভার্সিটির হলে গুটি কতক ছাত্রের সমাবেশে ঈদের জামাতে আংশ নিলাম আমি একমাত্র আন্ডার গ্রেজুয়েট ছাত্রী, আমার ভাল লেগেছে এই প্রিভিলেইজ পেয়ে। তারপর আভিবাসি এই তিন দশক জীবনে ঈদের নামাজে যোগ দিতে পারা আমার ঈদের আনন্দের একটা সুন্দর অনুভুতি। দু’বছর আগে ঢাকাতে আমি ঈদের জামাতে গেছি যার রেওয়াজ আমাদের ছোটবেলায় ছিল না। এবারের ঈদ হবে সাপ্তাহিক কাজের দিনের মাঝে- আর এরকম হলে সপ্তাহ শেষের ছুটির দিন দুটোতেই ঈদ শুভেচ্ছা বিনিময় হয় বন্ধু বান্ধব আত্মীয় স্বজনদের সাথে। এবার আমরা সবাই তারই প্রতিক্ষায় থাকবো যেন ঈদ আসে এই বসন্ত শেষের দিনটাতে অনেক ফুলের সুরভি মেখে আমাদের মাঝে সৌহাদ্য আর প্রীতির বন্ধনের অঙ্গিকার নিয়ে।

ঈদ মোবারক ২০১০।

পূজোঃ

শৈশব কৈশরের ঈদের মত পূজোর দিনগুলোও আমার স্মৃতিতে উজ্জ্বল। আমি অনেক সময় জন্মভূমির গর্বে গর্বিত হয়ে বলে থাকি, ‘আমি বক্ষ্মপূত্রের পাড়ের কন্যা - আমার মত এও সুন্দর প্রতিমা দর্শন আর কে করেছে’! শিক্ষা সংস্কৃতির পীঠস্হান ময়মনসিংহ ই কোলে ধরেছিল ‘রশীদ’ পটুয়ার মত একজন ক্ষণজন্মা শিল্পীকে, যার হাতের শৈল্পিক পরশে জীবনত হয়ে উঠত মা দূর্গার অপরূপ রূপ। আমার মেয়েবেলায় মনে পড়ে খুব ঘটা করে সারদীয় দূর্গা উৎসব হত দুই সপ্তাহ ধরে আর তার সাথে মাইকে বাজতো ইন্ডিয়ান আধুনিক গান ‘এনে দে রেশমি চুড়ি, নাইলে যাব বাপের বাড়ি’ কিংবা ‘ললিতা ওকে আজ চলে যেতে বলনা - - -’ ইত্যাদি। বাংলাদেশ হওয়ার আগের স্মৃতি আমার অস্পষ্ট, তবে মনে পড়ে কাজের মানুষের কোলে চড়ে বা তাদের হাত ধরে আমরা পূজো দেখতে যেতাম বিকেলে। আলোর মালায় আর ধূপ ধুনোর ঘ্রানে শহরটা কেমন যেন মোহময় হয়ে উঠতো। বড় বড় রিভলভিং মন্ডপে মা দূর্গা তার সুশ্রী সন্তানদের নিয়ে ঘুরে ঘুরে আসতেন সিংহের পিঠে সাওয়ার হয়ে। শহরে ধনী হিন্দু সম্প্রদায়ের মাঝে যেন চলত মন্ডপ সাজানোর প্রতিযোগিতা। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর ও কয়েক বছর আমরা সুন্দর সব পূজো দেখেছি, জানিনা এখন ও ওমনি পূজোর আনন্দে মেতে উঠে কিনা আমার জন্মের শহর। পূজোর শেষের দিনের আরতি নৃত্য আমার ভাল লাগতো আবার মন খারাপ হত যখন খোলা ট্রাকে শহর পরিদর্শনের পর মা দূর্গা আর ছেলে মেয়েদের বিসর্জন দেওয়া হত মাঝ নদীতে সাজানো বড় বজরায় করে নিয়ে যেয়ে। আমাদের বাসায় পূজোর সময় আসতো নানা মিষ্টি আর মুড়ি মুড়কি নাড়ু, কেননা আমার বাবার প্রায় সব বিজনেস ম্যানেজারেরাই ছিল হিন্দু সম্প্রদায় ভুক্ত - তাদের বিশ্বাস ভাজনতার জন্য। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর পাড়ার কিংবা স্কুলের বন্ধুরা নিমন্ত্রণ করতো পূজোর সময়, এর মাঝে আমার এক বান্ধবীর বাড়ীতে আমায় যেতেই হতো কেননা ওর দিদিমা আমায় কেন যেন অপরিসীম স্নেহ করতেন। আজ আমার বন্ধুর সুন্দর ‘অতসী’ নামটা ছাড়া আমার আর কিছুই মনে নেই, ওর সাথে সব যোগাযোগ হারিয়েছি প্রাইমারি স্কুল ছেড়ে আসার পর পরই।
স্বাধীনতার আগে শহরের বড় বড় মন্ডপে মূর্তি বানানোর ভার পরতো ‘রশীদ’ শিল্পীর উপর। উনি এক কিংবদন্তি চরিত্র ছিলেন ময়মনসিংহে। লোকে বলত উনার গড়া প্রতিমা রাত তিনটার পর প্রাণ পায়, অনেকে নাকি দেখেছেও তা। আমাদের কাজের মানুষেরা এসব গল্প বলত আর সেই ছোটবেলায় তা সত্য বলেই প্রতিয়মান হত আমাদের কাছে।

মা দূর্গাকে আমার স্নেহময়ীই মনে হত, তবে কালি প্রতিমার প্রাণ পাওয়ার গল্পকথায় আমার মন ভয়ে শুকিয়ে আসতো নর মুন্ডের মালা পরিহিত ডাকিনি যোগিনি সহ তার নিশি ভ্রমনের ছবি কল্পনা করে। কালিপূজার চারটা দিন সন্ধ্যার পর পর আমি তাই মায়ের আঁচলের কাছাকাছিই নিরাপদ বোধ করতাম। আমাদের সময় হিন্দু মুসলিম সম্প্রদায়ের ভিতর সৌহাদ্যই দেখেছি বেশি তবে বেশ কয়েক বছর কালি বা দূর্গা পূজা রোজা বা কোরবানী ঈদের কাছাকাছি বা একই সময় পরেছে বলে হিন্দু মুসলিম সম্প্রদায়ের ভিতর ধর্মিয় অনুভুতি নিয়ে কিছু সুযোগ সন্ধানি মানুষ চাপা উত্তেজনার সৃষ্টি করত বলেও আভাস ও পাওয়া যেত।
একবার রশীদ শিল্পীকে আমি দেখেছিলাম ১৯৭০র জলোচ্ছ্বাসের পর। উনি ঐ ভয়াবহ দূর্যোগের চিত্র ফুটিয়ে তুলতে আহত নিহত মানুষের মূর্তি গড়ে ছিলেন। আমার বাবা মা তখন সক্রিয়ভাবে স্বৈরাচারি শাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলনে অংশ নিচ্ছিলেন। আমার ঐ বয়সে দেখা রশীদ শিল্পীর আবছা হয়ে যাওয়া ছবিটা কোন সাধারণ শিল্পীর অবয়বের থেকে আলাদা মনে হয়েছে - উনার সূবর্ণ রং এবং প্রশান্ত চেহেরায় উনাকে একজন বুদ্ধিজীবি বলেই আমার কাছে প্রতিয়মান হয়েছে। স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় 'শিল্পী' হওয়ার অপরাধে পাকসেনাদের নিষ্ঠুর বুলেটের আঘাতে উনার সব সৃষ্টির পরিসমাপ্তি ঘটে। হয়ত বা বাবা মার মুখে এত শুনেছি বলেই, কিংবা উনার শিল্পী সত্ত্বা আমার ঔ বয়সেই আমার মননের উপর এক সুকুমার ছায়া ফেলেছিল বলে আমার স্মৃতিতে উনার অস্তিত্ব আজও অম্লান। ক'বছর আগে ল্যুভের স্কাল্পচার সেকশনে ঢুকেই জানিনা কেন যেন উনার কথাই আমার মনে পড়েছে, যে শিল্পী স্বত্বা মানুষের নিষ্ঠুর হিংসতায় হারিয়ে গেল পূর্ণ বিকশিত হওয়ার আগে।
পূজার মুড়ি নাড়ু প্রাসাদ ঈদের সুস্বাদু খাবারের মত একটা উল্লেখযোগ্য অংশ ছিল। বহুদিন দেশের মাটিতে পূজো দেখা হয়নি তবে তিন চার বছর আগে কোলকাতায় সারদীয় দূর্গা উৎসব দেখার সুযোগ হয়েছিল। যদিও ফুলের আয়োজন ছিল অনেক আজকের এই একবিংশ শতাব্দীর পুজা মন্ডপে, তবে রশীদ শিল্পী গড়া দূর্গা প্রতিমার রূপ আমার নয়নে কেউ হারাতে পারনি। পূজোর ফুলের কথা বলায় মনে পড়ল আমার বাবা মার দু'জনের ফুলের বাগানের প্রতি মমতার কথা, আর তার ফলশ্রুতিতে আমাদের একটা বিরাট ফুলের বাগান ছিল। যার গোলাপী স্হলপদ্ম ছিল আমাদের পাশের ম্যাডিক্যাল কলেজের স্বরস্বতী পূজার প্রধান উপাচার। অন্যপূজার সময় ও আমাদের বাগান থেকে নেওয়া হতো ফুল। আমাদের দারওয়ান পূজোর ক'টা দিন আমার বাবা মার নির্দেশে উদার হত ফুল বিতরনে। আমাদের বাড়িটা এখন ও আছে, বাগানটা নেই - কিছু এবড়ো থেবড়ো কাঠামো কেড়ে নিয়েছে বাড়ীটার সৌন্দর্য্য। প্রাণ না থাকলে কে সৌন্দর্য্যের পূজা করবে - বল? এমনি করেই গাদা গাদা ইট পাথরের আড়ালে হারিয়ে গেছে, যাচ্ছে আমাদের পদ্মা মেঘনা বক্ষ্মপূত্রের তীরের সহজ সরল প্রাণময় সাংস্কৃতি, আমাদের মানবিক ভিত্তি, মানুষের ছোঁয়া। কিংবা এমনি ভাঙ্গা গড়ার খেলার মাঝেই তৈরি হচ্ছে আর এক নূতন সংস্কৃতি, হয়ত বা তা মেশিনের সংস্কৃতি, ছোট একটা ব্লু চিপসে্ বন্দী এক আঙ্গুলি পেশনে সহস্র ডিজাইনে প্রস্ফুটিত আর এক নূতন প্রজন্ম।

সবাইকে পূজোর অভিনন্দন।

১৮ই নভেম্বর ২০১০